22/23

এই সংখ্যায় ভেতরের পাতায়
√ বায়োগ্যাস চালিত ট্রেন
√ মরণোত্তর কর্নিয়া দান
√ মিশরের সৌধগুলির সর্বনাশ
√ লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী বনবেড়াল
√ নিউক্লিয় চুল্লি না অপ্রচলিত শক্তি

বিজ্ঞান অন্বেষক

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৩ সংখ্যা ৪ ও ৫ জুলাই - অক্টোবর/২০০৬ RNI No. WBBEN/03/11192 দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

শকুনের খোঁজে

— 'পৃথিবীটা কি শুধু মানুষের বসবাসের জন্য!'

— 'কেন! কি হলো! হঠাৎ এ কথা বলছিস।'

— 'ঐ দেখ, ঐ যে ডোবার পাশে। কুকুর দুটো ঐ মরা-পচা জন্তুটাকে নিয়ে কেমন কামড়া-কামড়ি করছে। আচ্ছা বিশাল আগের মত কৈ শকুনের তো দেখা পাওয়া যায় না।'

— 'ও! তাই! তুই গৃধিনীর কথা বলছিস। আরে, ধ্যুৎ! কুৎসিত দেখতে ঐ পাখিটাকে না দেখলেই নয়। বিভৎস গন্ধ চল-চল পালাই।'

দুই বন্ধু ওরা। অংশুমান আর

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

অলৌকিক গাছ

বিশ্বাস : গাছ থেকে জল বেরোচ্ছে। রাতারাতি গাছটি হয়ে উঠল 'অলৌকিক গাছ'। গাছের গায়ে ফুলমালা, ধূপধুনো দিতে দিনভর ধরে চলে জল সংগ্রহের প্রতিযোগিতা। গাছকে ঘিরে পুজো-পার্বণ শুরু হয়ে যায়।

ঘটনা : উত্তরবঙ্গের অনেক জঙ্গলে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়লে, সেই গাছের ডালের ভাঙ্গা অংশ থেকে জল বেরোতে থাকে। জঙ্গলের 'কোর এরিয়ার' বহুগাছ থেকেই এভাবে দিনের পর দিন জল বেরোতে থাকে।

এরপর ৬ পাতায়

ছোঁয়াচে হাসি

ফুল যদি হয় গাছের হাসি, মানুষের হাসি তবে ফুল। মুখপল্লবের ফুল হচ্ছে হাসি। এ এক অনুপম অনুভূতির অভিব্যক্তি। আবেগের আবিরে রাঙা অজস্র ভাঙা জীবন জোড়া লাগানোর অব্যর্থ এক আঠা যা শরীরী হয়েও অশরীরী। সামান্য এক স্ফুলিঙ্গ যেমন দূর করে দেয় অন্ধকার, অসামান্য এক চিলতে হাসিও পারে মোড় ঘুরিয়ে দিতে গোটা জীবনের।

কবে প্রথম মানুষ হাসতে শিখেছে, ডারউইন বলে যাননি। ইভল্যুসনের পথ ধরে কত কত সময় পার হয়ে গেছে যুগ, মহাযুগ — জুরাসিক, ট্রায়াসিক, মিলুরিয়ান। কিন্তু কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক এখনো 'জমাট হাসির' কোনো 'জীবাশ্ম' পেয়েছেন কিনা আমাদের জানা নেই। কিশোর তুতেখ আমেনের মমির মুখে হাসি লেগে আছে কিনা তাও।

না পাওয়া যাক, ক্ষতি নেই, জীবাশ্মের বদলে জীবন্ত হাসিই পেয়েছি আমরা অনেকরকম। দেঁতো হাসি, অট্টহাসি, কাষ্ঠহাসি, মুচকি হাসি, বাঁকা হাসি, থার্টি টু অল আউট হাসি ইত্যাদি ইত্যাদি। কখনো হা হা, কখনো হো হো কখনো বা হি হি। শিশুদের খিলখিল হাসি নাই বা বল্লাম। নাই বা বল্লাম ভুবনমোহিনী মোনালিসার সেই রহস্যময় হাসির কথাও। যে বিশেষণেই বিশেষিত করি না কেন, হাসির ভেতরে নিহিত থেকে যায় অবশ্যই এক আনন্দ।

অবশ্যি হাসতে হাসতে কারো চোখে জল এসে যায়। ও তো আসলে আনন্দাশ্রু — মনের ভেতরের সমস্ত মালিন্য ধুয়ে জল হয়ে যাওয়া। হয়তো একেই মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন : Catharsis. হাসতে হাসতে হালকা হয়ে যায় মনোভার। হাসি যেন নিজের হাতেই (ঠোঁট পড়লে ভাল হয়) বানানো আশ্চর্য এক দুঃখনাশিনী অতনু মলম — পেইন কিলার। কেবল কী ঠোঁট হাসে? অনুভবী মানুষমাত্রেই জানেন চোখও হাসতে জানে, হাসতে জানে আমাদের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরাও কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ, থাক। মনোবিজ্ঞানের আওতা ...

আদৌ পেইন কিলার কিনা জানি না। তবে বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই হাসির ভেতরেই পেয়ে গেছেন সুস্বাস্থ্যের এক অনন্য চাবিকাঠি। আমরা খালিচোখে যা দেখি তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি আমরা দেখি না। হাসির প্রভাব শরীরে ও মনে পড়ে বৈকি — ফলে রুগ্ন শরীর তাজা হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক (যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন), মন চনমনে। এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। বলাই বাহুল্য তথাকথিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন। বুস্টার ডোজের মত হাসি যেন বাড়িয়ে দেয় আমাদের আয়ু। বেশি হাসলে, জোরে হাসলে, বেশি অক্সিজেন শরীরে ঢোকে, 'হার্ট শক্ত হয়' এমন ধারণা নিছক ধারণা নয় আর। হাসির সিনেমা কিংবা কোনো ভিডিও শো দেখার পরে বিজ্ঞানীরা

এর পর ২ পাতায়

চেরনোবিলের কুড়ি বছর

২৫-২৬ এপ্রিল ১৯৮৬। রাত ১-২৩ মিনিট। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার (আজকের ইউক্রেন) বেলারুশ সীমান্তের কাছে, চেরনোবিল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্পের রিয়্যাক্টর ৪-এ ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটল। এটিই আজ পর্যন্ত বৃহত্তম ও ভয়ঙ্করতম পারমাণবিক চুল্লী (Nuclear Reactor) দুর্ঘটনা। ৪ নম্বর রিয়্যাক্টরের পাইল ক্যাপ বিস্ফোরিত হয়ে বিপুল তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকাকারে আকাশে বাতাসে, মাটিতে, জলে ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ফোরণের কুড়ি বছর পরেও এই তেজস্ক্রিয়তা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত করে যাচ্ছে।

বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ মেগাকুরী। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু হল ৩০ জনের। বিস্ফোরণের পর পর প্লান্টের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা থেকে ৪৫ হাজার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ৪মে তারিখে, সরিয়ে নেওয়া হল ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাসকারী প্রায় ১ লক্ষ মানুষকে। দুর্ঘটনাটি রাশিয়ায় হলেও তার প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত নই। তেজস্ক্রিয়তা বাতাসের সঙ্গে মিশে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যেই দূরবর্তী চাষীদের খামারে ৩৫০টি বাছুর, ৮৭টি শূকরছানা, ৬৪টি অন্যান্য জন্তু বিকৃত অঙ্গ নিয়ে

এর পর ৬ পাতায়

ছোঁয়াচে হাসি

১ পাতার পর

সেইসব মানুষদের রক্ত পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেছেন, কেন না তাদের রক্তে পাওয়া গেছে বেনডরফিন (Bendorphine) নামক এক ধরনের জৈব যৌগ যা মস্তিষ্ক থেকে নিঃসৃত হয় (যা ব্যথা ও আনন্দের অনুভবকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম)। ঐ বেনডরফিন নয় নয় করেও ২৭ শতাংশ বেড়ে গেছে ঐরকম মজার সিনেমা দেখার অব্যবহিত পরে। শুধু কি তাই? আরো অবাক করা কথা শুনিয়েছেন বিজ্ঞানী লি বার্ক, বলেছেন, ৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি (Groth)র হরমোন অর্থাৎ যাকে আমরা STH বা সোমাটোট্রপিক হরমোন হিসেবে জানি, তা বেড়ে যায় এসব মানুষদের মধ্যে।

কিন্তু এতো গেল হাসি বা মজার সিনেমা দেখার পরের অবস্থা। 'আজ একটা হাসির ফিল্ম দেখবো' — এই 'দেখবো দেখবো' আশার আনন্দেও নাকি রক্তের ভেতরে বেড়ে যেতে পারে হরমোনের স্তর — দুধের উপরে সরের স্তরের মত সেইসব হরমোন যেগুলি রোগপ্রতিরোধী এবং অনাক্রম্যতার (Immune) অধিকারী যার ক্রিয়াশীলতাও দীর্ঘক্ষণ থেকে যায়। ফলে শরীরের রক্তসংবহন ক্রিয়াও স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে শরীরের অনুকূল।

শুধু এই নয়। হাসি শরীরের ভেতরের কমিয়ে আনে কর্টিসোল (Cortisol) এর মাত্রা। যে কর্টিসোল ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় অর্থাৎ ইনস্‌মোনিয়ার জন কিছুটা হলেও দায়ী, যে কর্টিসোলের আধিক্য মেজাজমজি নষ্ট করে দেয়, যৌন অনীহা আনে, উপরন্তু মিষ্টিদ্রব্যের প্রতি বিবমিষা — সেই কর্টিসোলের মাত্রা কমিয়ে দেয় হাসি — একটু হাসি, হালকা কিংবা অট্ট। ব্লাডপ্রেসারও কমিয়ে দেয় হাসি, রক্তের ভেতরে এপিনেফ্রিন বা অ্যাড্রেনালিন ক্ষরণের ফলে যা সম্ভব।

লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী লি বার্ক মোট ১৬ জন স্বাস্থ্যবান মানুষের উপরে একটা পরীক্ষা করেছিলেন। আটজন করে মোট দুভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন তিনি ঐ ষোলজনকে। প্রথম দলকে দিয়েছিলেন একটা বেশ মজাদার ভিডিও এবং দ্বিতীয় দলকে দিয়েছিলেন বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের সিরিয়াস পত্রপত্রিকা। অবশ্যি পরীক্ষা শুরুর আগে, পরীক্ষা চলাকালীন এবং পরীক্ষা শেষের পরে দুদলকেই দিতে হয়েছিল বাধ্যতামূলক তাদের রক্তের নমুনা পরপর তিনবার। সতর্কতা হিসেবে দুই দলকেই রাখা হয়েছিল সমান পরিবেশে, সমান ঘরোয়া উষ্ণতায়। কিন্তু অবাক, পরীক্ষার পর দেখা গেল দু'দল দুরকম আচরণগতভাবে একদম বিপ্রতীপ — দুই মেরুর বাসিন্দা যেন ওরা। আর এজন্যই ডাক্তারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ তারা যেন তাদের পেশেন্টদের ভাল এবং হাসিখুশী থাকার নতুন এক জীবনশৈলী বাতলে দেন। শুধু রোগীদেরই বা কেন? আমরা যারা সুকুমার রায়ের সেই 'গোমড়াথেরিয়ামে'র দল, অতিরিক্ত শাসন আর নিষেধের জাঁতাকলে পড়া 'হাসতে যাদের মানা' — তাদের জন্যও তো হতে পারে এই হাসির খেরাপি।

শহরে আজকাল, অনেক ছোটবড় 'Laughing Club' গড়ে উঠেছে। আরো উঠুক। হাসির নাটক হোক, গল্প লেখা হোক আরো, দমবন্ধ করা হাসির আওয়াজ উঠুক চারিদিকে। পুনর্জন্ম হোক ত্রৈলক্যনাথের, শিব্রামের, দাদাঠাকুরের। হাসতে হাসতে লিখে ফেলুন কবি : আয়ু লিখি (শঙ্খ ঘোষ।

আয়ু তো বটেই। কেন না যাতে আয়ু বাড়ে অর্থাৎ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে যেসব আনুষঙ্গিক কারণ, সেগুলিকে উস্কে দিতে হাসির কোনো জবাব নেই। যেমন, এক নম্বর, হাসি বাড়িয়ে দিতে পারে আমাদের লালারসের ভেতরে অ্যান্টিবডি যা শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। পারে পাকস্থলির আলসার কমিয়ে দিতে বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক ক্ষরণের মাধ্যমে। অ্যাবডোমেন বা নিম্ন উদরের পেশীগুলিকে যথাযথভাবে সক্রিয় রাখার জন্যও হাসির প্রয়োজন। 'শ্বাসবায়ু গ্রহণের উন্নতি ঘটানোও হাসির আরো এক কাজ যা ক্রনিক শ্বাসকষ্ট রোধে সক্ষম। দেহের কোষে ও কলায় পুষ্টি ও অক্সিজেন যাতে ভালভাবে সংবাহিত হয় সেদিকেও 'হাসির দৃষ্টি' রয়েছে। ইন্টারলিউকিন-টু নামে একটি জৈব যৌগের নিঃসরণ ছাড়াও অন্যান্য কিছু অনাক্রমধর্মী হরমোনও বের হয় দুষ্টুমিষ্টি হাসির জন্য। আর হ্যাঁ, বাতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন, তাদের জন্য সুসংবাদ — হাসুন, আরো হাসুন, দেখবেন বাতের লক্ষণগুলি শরীরের 'লক্ষণরোখা'র ধারেকাছেও ঘেঁষছে না। ছোঁয়াচে নাকি? হাসি কী ছোঁয়াচে? হ্যাঁ ছোঁয়াচে তো বটেই, তবে রোগ নয়। যদিও আমরা জানি 'Smile is contegious'। তা হোক Be a carrier, please.

—জগন্ময় মজুমদার, শিক্ষক,
শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র হাইস্কুল।

বায়োগ্যাস চালিত ট্রেন

সম্প্রতি পৃথিবীর প্রথম বায়োগ্যাস চালিত ট্রেন চালু হল ইউরোপের সুইডেনে। জৈব বর্জ্য দিয়ে এই জ্বালানি তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সুইডেন দেশটিই সবচেয়ে বেশি জ্বালানি সম্ভাবনাময় দেশ। বায়োগ্যাসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি তেলের মতো অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে হবে না।

গাছের কাটা ডাল, পাতা এবং পশু বর্জ্য দিয়ে এই বায়োগ্যাস তৈরি করা হয়। তথাকথিত প্রচলিত শক্তিগুলির উপর নির্ভর করে চালিত হওয়া ট্রেন বা অন্যান্য যানগুলি থেকে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে বায়োগ্যাসের মত অপ্রচলিত শক্তিগুলি খুবই সময়োপযোগী। পরিবেশ দূষণরোধে এই উদ্যোগ আগামী দিনে পৃথিবীতে এক নতুন পথ দেখাবে বলে আশা করা যায়।

কুষ্ঠরোগ ভয়াবহ আকার নিতে পারে

সারা ভারতে কুষ্ঠ রোগ আদৌ নির্মূল হয়নি। সারা ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলির মধ্যে মাত্র ১১টি ঐ লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে (WHO) প্রতি ১০ হাজার জনের মধ্যে মাত্র ১ জন কুষ্ঠরোগী পাওয়া গেলে তবেই কোনও রাজ্য কুষ্ঠ নিবারণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছিল, অথচ সমীক্ষা করে দেখা গেছে কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। WHO এর মতে কুষ্ঠ রোগ নির্মূল কর্মসূচীতে শৈথিল্য দেখানোর ফলেই কুষ্ঠ মারাত্মকভাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এই রোগে অথর্ব হয়ে পড়া মানুষদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। এ বিষয়ে ৫০ কোটি টাকায় একটি তহবিল গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞ ও কর্তাব্যক্তিরা।

পাখিদের কথা

১ পাতার পর

বিশাল। উভয়েই বিজ্ঞানে স্নাতক। অংশুমান প্রাণী বিজ্ঞানে ও বিশাল গণিতে স্নাতক। বৈকালিক আলাপচারিতা ও পায়ে পায়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হেঁটে চলাই ওদের প্রায় নিত্যকার কর্ম। বিশাল অংশুমানের মুখে দেখলো ঘন কৃষ্ণ আষাঢ়ের মেঘ। সেই মুহূর্তে অংশুমানের চিন্তার আকাশে অস্ফুটে যে ছবি ভেসে উঠেছিল তা হলো পরিবেশের এক আসন্ন দুর্যোগ।

সত্যই তাই। ভারতে অত্যন্ত দ্রুত যে পাখিটা লুপ্ত হতে শুরু করেছে সেটা বোধহয় শকুন। শুধু ভারতে নয় সারা পৃথিবী জুড়ে এদের সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। ভারতে তিনটি প্রজাতির শকুন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন উজ্জ্বল সাদা বর্ণের পালকে ঢাকা পৃষ্ঠদেশ, বিজ্ঞানসম্মত নাম *জিপস্ বেঙ্গালেনসিস*, অপেক্ষাকৃত লম্বা-দৃঢ় চঞ্চু বিশিষ্ট, নাম *জিপস্ ইণ্ডিকাস*, সরু অথচ লম্বা চঞ্চু বিশিষ্ট, নাম *জিপস্ টনুইরসট্রিস*। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৯৫ ভাগ শকুন নিঃশেষিত। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মায়নামারেও একই অবস্থা জানা গেছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এদের দ্রুত লুপ্ত হওয়ার কারণ এখনও রহস্যাবৃত। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে অনেক মত-পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানী মহলের ধারণা এরা কোন বিশেষ ভাইরাসঘটিত রোগের শিকার। অনেকের মতে বিষাক্ত কোন রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ অথবা কীটনাশক এদের দ্রুত হারে মৃত্যুর কারণ। সুউচ্চ বৃক্ষের ক্রমাগত নিধনের ফলে এই অত্যন্ত নিরীহ পাখিটির বাসস্থানের অভাব ও মৃত-গলিত পশু খাদ্যের অভাবই শকুনের দ্রুত হারে মৃত্যু বা বিলুপ্তির কারণ।

এই অত্যন্ত নিরীহ পাখিটিকে বাজ, ঈগল এবং চিলের প্রায় সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে এরা *ফ্যালকনিফর্মেস* বর্গের *ক্যাথারটিডি* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের দেহের আকৃতি ঈগলের থেকে কিঞ্চিত বড়, ঠোঁট ও পায়ের নখ অত্যন্ত শক্ত ও ধারালো। এরা উচ্চ আকাশে দিনের প্রায় সবসময় খাদ্যের সন্ধানের ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে এবং কিছু মুহূর্ত অন্তর জোরালো আওয়াজে ডাকে। তীক্ষ্ন নজরটি থাকে নীচের ভূমির দিকে। তাই বাংলাভাষায় প্রচলিত একটা অপবাদ আছে, 'যেন শকুনের দৃষ্টি, যত উচ্চেই থাক দৃষ্টি ঠিক ভাগাড়ের দিকে'। এদের ঘ্রাণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি অত্যন্ত প্রখর। এদের একমাত্র খাদ্য মৃত-গলিত পশু-পাখির দেহ।

১৯৯৬-৯৭ সালে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি শকুনের উল্লেখযোগ্য হারে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ অনুসন্ধান বা তদন্ত কমিটি গঠন করে। ১৯৯৭-এর মে মাসে এই সোসাইটির বিজ্ঞানী ডঃ বিভু প্রকাশ ভরতপুরের কিয়োলাডো জাতীয় উদ্যানে প্রথম অনুসন্ধান তথা তদন্ত কার্য চালান। শকুনের সেই প্রজনন ঋতুতে প্রায় ৪০টি শকুনকে কোন এক অজ্ঞাত রোগের কারণে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভারতের আরও কয়েকটি বর্জ্যে এদের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়। তারপর মিঃ প্রকাশ ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁদের অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যান। তাঁদের অনুসন্ধান পর্বে বেশকিছু জীবিত শকুনকে কেমন অস্বাভাবিক অর্থাৎ জীবন্মৃত অবস্থায় গাছের ডালে বসে থাকতে দেখেন। ঐ শকুনগুলির মাথা পেটের কাছে ঝুঁকে পড়েছে যেন ঘাড় ভেঙ্গে গেছে এইরূপ অবস্থায় দেখেন। মৃত কয়েকটি শকুনের দেহ পুনের পোলট্রি ডায়গোনস্টিক এন্ড রিসার্চ সেন্টারে ও ভারতীয় বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য সমবায় মহাবিদ্যালয়, হিসার এ নিয়ে এসে পরীক্ষা করে দেখেন যে, শকুনগুলি একপ্রকার আন্ত্রিক অসুখ, বৃক্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে মারা গেছে। কতিপয় মৃত শকুনের দেহে মাত্রাতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিড সঞ্চয়ের ফলে হৃদযন্ত্র ও বৃক্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বলে তাঁদের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের আরও ধারণা পরিযায়ী পাখিদের দেহ থেকে কোনপ্রকার সংক্রমণও এদের দ্রুত হারে মৃত্যুর কারণ।

সুতরাং এই বিশেষ প্রজাতির পাখিটিকে চিড়িয়াখানা অথবা অন্যত্র বন্দী অবস্থায় প্রজনন ঘটিয়ে পরিবেশে পূর্বের অবস্থায় কি ফেরানো অসম্ভব? আন্তর্জাতিকভাবে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই সচেষ্ট হয়েছেন যাতে মরিশাসের ডোডো পাখির ন্যায় এরা অর্থাৎ শকুনরা পরিবেশ থেকে চিরতরে হারিয়ে না যায়। এই প্রকট সমস্যার কথা ভেবেই দি রয়েল সোসাইটি ফর প্রোটেকশন অব বার্ডস, ইউ কে-র বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট রাইসব্রাউ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। ২০০১ সালে পুনেতে Indian Vulture Diseases investigation Centre প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হরিয়ানায় স্থাপিত হয়েছে Vulture Care Centre এবং UK সরকারের অর্থানুকুল্যে এই সেন্টারে শকুনের তথা অন্যান্য পাখিদের বিবিধ সংক্রমণ রোগের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ও সর্বাধুনিক প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি গড়ে উঠেছে। কোন-কোন পক্ষী চিকিৎসকেরা Dielofenac নামক ওষুধের মারাত্মক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যে ওষুধটি পশু চিকিৎসকরা রোগগ্রস্থ যন্ত্রণাকাতর পশুদের দেহে অধিক প্রয়োগ করে থাকেন। মৃত পশুদের দেহে Declofenac অধিক পরিমাণে থাকায় ও এইরূপ মৃত পশুদের দেহ খাদ্য হিসাবে গ্রহণের ফলে শকুনরা দ্রুত বৃক্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। যাই হোক, পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে তথা বিচিত্র বিচিত্র কঠিন ব্যাধির হাত থেকে আমাদের ও আমাদের উত্তরসূরীদের জীবন রক্ষার্থে শকুনকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় পরিবেশে তাদের উপযুক্ত স্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে। সুন্দর এই পৃথিবীতে ওদেরও বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর মানুষই পারে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে।

—মধুসূদন চ্যাটার্জি, শিক্ষক।

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার— কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা— চাকদহ,
ফোন : ০৩৪৭৩২৪৩৩২৯/৯৪৩৪১১০৯৬৯
ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা— ত্রিবেণী, ফোন : ২৬৮৪-৫৫৫৪
হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি
— ফোন : ২৫৮২-১১২৯
কোচবিহার— কাছারিমোড় (নিউজপেপার এজেন্ট), নীলকুঠি।
জলপাইগুড়ি— তপন সেন, সেন ফার্মেসী, আলিপুর দুয়ার জং।
ফোন : ৯৪৩৪০৮৭৪৬৬
কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩

চেরনোবিল

১ পাতার পর

জন্মায়। ক্রিস্টোফার ক্ল্যাভিয়ের মতে এই দুর্ঘটনা ভারতের মতো কোনো জনবহুল দেশে ঘটলে তৎক্ষণাৎ মারা যেতেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। দুর্ঘটনার কয়েকদিন পর অগ্নি নির্বাপন কর্মী, সেনাবাহিনী এবং উৎসাহী নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের এলাকায় এক বিরাট পাথরের আধার নির্মাণ করে। তাদের আশা, এই আধারটি ২০-৩০ বছর পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তাকে আটকে রাখতে সাহায্য করবে।

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর তার ক্ষতির মাত্রা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা এবং সংখ্যাকে লঘু করার চেষ্টা করছেন। বিশ্বের নিরপেক্ষ বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারমহল প্রায় ৫০টি গবেষণা করে এই অভিযোগ করেছেন। গ্রিনপিস ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্রিটেন, জার্মান, ইউক্রেন, স্ক্যান্ডানেভিয়ার দেশগুলি এই বিজ্ঞানী এবং ডাক্তারদের নিয়োজিত করেছিলেন।

ইউক্রেনের তেজস্ক্রিয়তা সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের উপ অধিকর্তা নিকোলাই-এর মতে, ইউক্রেনের যে ২০ লক্ষ-মানুষ চেরনোবিলের শিকার হিসেবে সরকারীভাবে চিহ্নিত ছিলেন, তার মধ্যে ৫ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন। চেরনোবিল সাফাইয়ের কাজে যে মানুষগুলিকে নিয়োজিত করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৪,৪৯৯ জন ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন। দুর্ঘটনার পর থেকে তেজস্ক্রিয়তার ধারাবাহিক প্রভাবের ফলে শিশু মৃত্যুর হার ২০-৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে।

নব্বই এর দশকে হার্টের রোগে এবং লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২৩০ জন প্রাণ হারান। ইউক্রেন সরকারের তেজস্ক্রিয়তা ঔষধ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রের ডিরেক্টর এডজেনিয়া স্টেপালোভা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন যে, তারা থাইরয়েড ক্যান্সার, লিউকিমিয়া এবং প্রজনন পরিবর্তনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের মতে, ১৯৮৬-এর তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে ক্যান্সার সংযুক্ত রোগে অদূর ভবিষ্যতে মারা যাবেন প্রায় ৩০ হাজার মানুষ, ৮৬ সালে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা অল্পবয়সী ছিল, তাদের ক্ষতির পুরো চেহারাটা এখনও পরিস্কার হয়নি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত ক্যান্সার প্রকাশ পেতে ২০-২৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে। বেলারুশের National Commission of Radiation Protection এর সভাপতি জ্যাকভ কেনিগ্‌স্‌বার্গ-এর মতে, আগামী দিনগুলিতে চেরনোবিল এলাকার বহু মানুষকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বিদায় নিতে দেখব। আজ পর্যন্ত বেলারুশ, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রায় ৪০০০ শিশুর ক্যান্সার ধরা পড়েছে। যেখানে থাইরয়েড ক্যান্সার শুরুতেই ধরা পড়লে সেরে যায় সেখানে এই ক্যান্সারে ৯ জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে। International Atomic Energy Agency, World Health Organisation এবং United Nations Organisation এর আরো কয়েকটি এজেন্সি-র তৈরি বিশেষজ্ঞ কমিটি চেরনোবিল কোরাম' ২০০৫ সালের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০০০ জন লিউকিমিয়া এবং বিকিরণজনিত ক্যান্সারে মারা যাবে। বেলারুশের Internationa Sakharov Environmental University -এর অ্যালেক্সি ওকিয়ানভ চেরনোবিল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'a fire that can't be put out in our lifetimes.'

— গোবিন্দ দাস

মরণোত্তর কর্নিয়া সংগ্রহ

গত ৯৭-৯৮ সাল থেকে বিজ্ঞান দরবার 'মরণোত্তর চক্ষুদান' করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর চক্ষু সংগ্রহ করে মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ইনসটিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে পাঠিয়ে দেওয়ার কাজ করে আসছে। এ যাবৎ বেশ কয়েক জোড়া চক্ষু জমা করেছে বিজ্ঞান দরবার।

কৃষ্ণনগরের গোবরাপোতার শুভেন্দু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আর্থিক সহযোগিতায় বিজ্ঞান দরবারের সহ সম্পাদক সুরজিৎ দাস ও কার্যকরী সদস্য সুরজিৎ পাল হায়দ্রাবাদের এল ভি প্রসাদ আই হসপিটালে যথাক্রমে 'আই টেকনিসিয়ান' ও 'গ্রিপ কাউন্সেলর'-এর ট্রেনিং সম্পন্ন করেছেন।

গত ২৩ অক্টোবর পলাশী নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী বীনাপানি ভট্টাচার্য বয়সজনিত কারণে তাঁর পলাশীর বাড়িতে ভোর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বীনাপানি দেবীর ইচ্ছায় তাঁর নাতি পলাশ ভট্টাচার্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন, তাঁর ঠাকুমার চক্ষুদান করার। ২৩ অক্টোবর পলাশবাবু ছাড়াও বাড়ির সকলের ইচ্ছা অনুযায়ী ট্রেনিংপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান ও কাউন্সেলর বীনাপানি দেবীর চক্ষু সংগ্রহ করতে যান। চোখের মনির একেবারে উপরে স্বচ্ছ পাতলা আঁশের মত অংশ কর্নিয়া। কর্নিয়া দুটি অত্যন্ত সাবলীল এবং সুন্দরভাবে সংগ্রহ করেন আই টেকনিশিয়ান সুরজিৎ দাস। পুরো কাজটিতে দক্ষতার সাথে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে সহযোগিতা করেন গ্রিপ কাউন্সেলর সুরজিৎ পাল। কর্নিয়া দুটি সংগ্রহ করে এম কে মিডিয়ার মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। তুলে নেওয়া কর্নিয়ার শূন্যস্থানে 'আর্টিফিসিয়াল কর্নিয়া' (প্লাস্টিকের) ভালভাবে খাপ খাইয়ে বসিয়ে দেন সুরজিৎ দাস। বাইরে থেকে আর বোঝাই যাচ্ছিল না যে চোখ দুটির কর্নিয়া তুলে নেওয়া হয়েছে।

সংগৃহিত কর্নিয়া দুটি জমা দেওয়া হয় 'রিজিওনাল ইনসটিটিউট অফ অপথালমোলজি'তে। সুন্দরভাবে সংগৃহিত কর্নিয়া এবং এম কে মিডিয়ার সংরক্ষণ করা দেখে আই ব্যাঙ্কের কর্মরত অফিসাররা প্রশংসায় ভরিয়ে দেন দুই সুরজিৎবাবুকে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম বাইরে থেকে জমা পড়া চোখে পরিবর্তে কর্নিয়া জমা পড়ল রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজিতে। সত্যিই, এমন সুচারু পদ্ধতি যাতে কর্নিয়া তোলার পরেও চোখ-মুখের কোনও বিকৃতি নেই। এমনকি বোঝারও উপায় নেই চোখের কোন অংশ নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই সমবেত কণ্ঠে সকলের বলা উচিত 'চক্ষুদান নয়, কর্নিয়া দান করুন। কর্নিয়া জনিত অন্ধদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন।'

— পালাম, কাঁচরাপাড়া।

মরণোত্তর কর্নিয়া দানে অঙ্গীকার করুন

যেসব ব্যক্তি মরণোত্তর চক্ষুদান করতে ইচ্ছুক, তারা অবগত হউন— এখন চক্ষু না সংগ্রহ করে চোখের একেবারে উপরের পাতলা স্বচ্ছ আঁশের মত অংশ (কর্নিয়া) তোলার আধুনিক পদ্ধতি আমাদের হস্তগত। হায়দ্রাবাদের এল ভি প্রসাদ ইন্টারন্যাশনাল আই হসপিটাল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানগণ আধুনিক পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির কর্নিয়া সংগ্রহ করে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজিতে জমা করবেন। যোগাযোগ : বিজ্ঞানদরবার, কাঁচরাপাড়া, শুভেন্দু মেমোরিয়াল সেবা প্রতিষ্ঠান, গোবরাপোতা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ফোন : ০৩৪৭৩-২৪৩৩২৯

আখের সবুজপাতা মিশরের সৌধগুলির সর্বনাশ ঘটাচ্ছে

হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা এবং সমগ্র মানবজাতিকে আশ্চর্য্যের জগতে নিয়ে যাবার অধিকারী মিশরের গম্বুজ, সৌধ এবং মন্দিরগুলো সাম্প্রতিক কালে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের তোড়ে বিধ্বস্ত হতে বসেছে। সমুদ্রের এই লবণাক্ত জল এই অত্যাশ্চর্য সৌধের ভিতকে এতটাই ক্ষয় ধরিয়ে দিয়ে যে এদের ভবিষ্যত নিয়েই বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মিশরের আমুন, লাক্সর, কারণাকের বিশ্ব ঐতিহ্যবহনকারী, অসাধারণ স্থাপত্যসমন্বিত সৌধগুলি ৮০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবল সূর্যের তাপ সহ্য করলেও নোনা জলের আঘাত সহ্য করতে পারছে না।

মার্কিনি দুনিয়ায় মিশরের স্থাপত্য সম্পর্কিত যেসব গবেষকরা আছেন তারা এই ক্ষয়ে যাবার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্বের ঐতিহ্য (heritage) সংরক্ষণ প্রেমীদের কাছে সতর্কবার্তাও পাঠিয়েছেন। এই সতর্কবার্তাকে সমর্থন জানিয়েছেন মিশরের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের সর্ব্বোচ্চ সংস্থার (Supreme Council of Antiquities) সেক্রেটারী জেনারেল জাহি হাওয়াস।

গবেষকরা দেখেছেন, লাক্সর-এর মন্দির এবং কারণাকের মন্দিরগুলোর স্থাপত্য প্রায় ধ্বংসই হয়ে যাবে এই জলের ধাক্কায়। বিভিন্ন কারণে এই ঘটনা ঘটছে। আবহাওয়ার বড় ধরনের পরিবর্তনে বহু যুগ আগের নির্মিত ও ভীষণভাবে সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার প্রায় ভেঙে গড়বার আশঙ্কা। এছাড়াও রয়েছে স্থানীয় কৃষকদের আখ চাষের জন্য নীল নদের জলকে টেনে নিয়ে যাবার ভয়ানক উন্মাদনা। নীল নদের জল এখন আখের পুষ্টি জোগাচ্ছে।

চাষাবাদকে আরও বেশি বেশি করার কারণে এবং বছরে ৩টি ফসল পাবার উদগ্রতায় কৃষকরা নীলনদের জল টেনে নিয়ে ইক্ষু ক্ষেত ভিজিয়ে চলেছে। একদা মরুভূমি এখন সবুজ আখের পাতায় মুখ লুকিয়েছে। জমি সব সময় ভিজে থাকবার কারণে ভূগর্ভস্থ জলও কয়েকমিটার উচ্চতায় উঠে এসেছে। নগরায়ণের ও অত্যধিক কৃষি কাজের ফলে যেখানে দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ভূগর্ভস্থ জলস্তর যেখানে হু হু করে নেমে যাচ্ছে, সৌধস্থিত ভূগর্ভে জল উপরে উঠে আসছে। ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত।

ভূগর্ভস্থ জলের এই আলোড়ন, কারণাক, লাক্সর-এর সৌধ-মন্দিরের ভিতও নড়িয়ে দিয়েছে। মেদিনেত হাবুর মন্দিরের ভিতের ঐ একই অবস্থা। গুরুত্বের বিচারে পিরামিডের পরেই আমুনের মন্দিরের গুরুত্ব।

ভূগর্ভস্থ জলে নোনা জলের মাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। মন্দিরের ভিতের নরম বালু পাথর সেই নোনা জলকে শুষে নিচ্ছে। পরবর্তীতে লবণ থিতিয়ে যাবার পর পাথরের ফাঁকে লবণ জমে থাকছে এবং পাথরে ফাটল দেখা দিচ্ছে।

মন্দিরের গায়ে উঁচু ঢেউয়ের দাগ পরিষ্কার চোখে পড়ে। প্রতিবছরই সেই দাগ উঁচু থেকে উঁচুতে ছাপ রেখে যাচ্ছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচীন মিশর এবং সুদানের তত্ত্বাবধায়ক নিকেল ষ্ট্রাড্উইক বলেছেন, নোনা জল শুধু পাথরগুলোরই ক্ষতিসাধন করেছে তাই নয়, দেওয়ালের চিত্র প্রদর্শনীরও সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। লক্ষ্যণীয়, এই সমস্ত চিত্রকর্ম যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে এদের পুনরুদ্ধার বাস্তবিক অসম্ভব। পথ এখন একটাই : সমস্ত মন্দিরকে উঁচু করা। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

ঢেউ এবং স্রোতজনিত ক্ষতি আটকাতে সুইডেনের বৈজ্ঞানিক ৪ মিলিয়ন ডলার মার্কিন অনুদান পেয়েছেন এবং সেটা দিয়ে তারা বৃহদাকারের ড্রেন ব্যবস্থা কারণাক এবং লাক্সর-এ গড়ে তুলেছেন। লাক্সারের পূর্বপ্রান্তের বিশালাকৃতির স্তম্ভ এবং ষ্ট্যাচুগুলোকে রক্ষা করতেই বিজ্ঞানীরা এখন আগ্রহী। প্রাচীন স্থাপত্যের এগুলোই সেরা নিদর্শন। বিজ্ঞানী ক্রিস্টিনা কালবাগ বলেছেন, আগামী বছরের মধ্যেই এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

মিশরের গবেষকদের কাছে নীলনদের পশ্চিম প্রান্তের গম্বুজ এবং মন্দিরের ক্ষয়প্রাপ্ত দিক নিয়েই তারা চিন্তিত। মিশরের গবেষকরা মেদিনেত হাবু, আমেনহটেপ থ্রী, মট্যুয়ারি মন্দির, ভ্যালি অব্ কিংস, ভ্যালি অব্ কুইনসকে কিভাবে বাঁচাবেন সেই প্রশ্নেই বিচলিত। এই পশ্চিম প্রান্তেই কিন্তু আখ চাষের রমরমা। আমেনহটেপ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে জল স্রোত নজরে পড়বে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ভ্যালি অব কিংসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে জলস্রোতের কারণে। তুতেনখামেনের সমাধির অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এটা সবচেয়ে বড় সৌধ। সেকারণে এর ক্ষয় সবচেয়ে বেশী বিপদের সৃষ্টি করবে।

অবিরাম পর্যটকদের আনাগোনা, উত্তাপ এবং কুয়াশায় গম্বুজগাত্রের চিত্রকলা, খোদাই করা কাজ— সবই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। মিশরে আখচাষ যাতে বন্ধ না হয় এবং সমাধির পাশের জল সেচ যাতে কম হয় সে ব্যাপারে তাঁরা আর্জি জানিয়েছেন। প্রচুর ভর্তুকির সাহায্যে আখ চাষ মিশর কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত করে আসছেন। ফলে সমাধান পাওয়া খুব মুশকিল। — *সান্তনু বসু, চাঁচল কলেজ, মালদা, ৯৪৩৪৭১৭৬২৯*

পরিবেশ রক্ষার পরিবর্তে পরিবেশ বিপন্ন নীতি

গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাবার জন্য দক্ষিণমেরু অঞ্চলে লোহা ছড়িয়ে গুল্ম ও ফাইটোপ্ল্যাংটন সৃষ্টির কথা ভেবেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী জন মার্কিন। তবে মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কারণ, পৃথিবীর গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধির ফলে মেরুপ্রদেশে বরফ গলতে শুরু করেছে, ফলশ্রুতি হয়তো দেখা যাবে হারানো দীঘার মত একদিন তলিয়ে যাবে আজকের দীঘা। এবং কলকাতা চলে যাবে জলের তলায়। এইভাবে যদি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে চা-চাষ বৃদ্ধির জন্য অধিক জলের প্রয়োজনে পাহাড়ের উপরে জমাট বাঁধা বরফের উপর সিলভার কনা ছড়ানো হয়। সূর্যের তাপে সিলভার কনা উত্তপ্ত হলে বরফ জল হয়ে গলে নদীতে জল পরিবহন বৃদ্ধি ঘটায়। জলের সমস্যা মিটল, চা চাষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। লাভ, লাভ আর লাভ। কিন্তু প্রকৃতির কলম চালানোর ফল তো পেতেই হবে। পরবর্তী ৫ বছর নদীতে জলের প্রবাহ ভীষণভাবে কমে যায়। ফলে চাষ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। এই ঘটনা শুনে রাশিয়ার মতো আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সঠিক

এর পর ৬ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

দার্জিলিং জেলার সেবক রোডের ধারে এইরকম বহু বড় বড় গাছ দেখা যায়। ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে শিলিগুড়ি পুর নিগম রাস্তা চওড়া করার জন্য বেশ কিছু গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। গাছ কাটার জন্য তড়িঘড়ি উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়ে যায়। গাছ কাটা শুরু করতেই একটি বড় গাছের ('পানিলতা' আঞ্চলিক নাম, বিজ্ঞানসম্মত নাম *Tefrastigma leucostapylum*) ডালের কাটা অংশ থেকে জল বেরোতে শুরু করে। রাতারাতি গাছটি ঘিরে পুজো, ধূপধুনো, প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়ে যায়। বহু মানুষ পলিথিনের ঠোঙা নিয়ে গাছের জল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বিজ্ঞান : গাছের কাটা অংশ থেকে জল বেরোনোতে কোন অলৌকিকত্ব নেই। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। যে কোন গাছ কাটলেই ক্ষতস্থান থেকে জল বেরোয়। খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয় গাছের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে। আমরা এটা দেখে অভ্যস্ত বলে এর মধ্যে কোন অলৌকিকত্ব চোখে পড়ে না। গাছ বেঁচে থাকার জন্য মাটি থেকে জল শোষণ করে এবং জাইলেম নামক সংবহন কলার মাধ্যমে পাতায় পাঠায়। সংবহন কলাতে ক্ষত সৃষ্টি করলে এই জল বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে এই জলের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। গাছ পাতায় বা অন্যান্য সবুজ অংশে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। এই খাদ্য জলের সাথে মিশে উদ্ভিদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ফ্লোয়েম নামক কলার মাধ্যমে। এই জল শর্করার কারণে মিষ্টি হয়। ফ্লোয়েম কলায় ক্ষত সৃষ্টি হলে এই মিষ্টি জল বেরিয়ে আসে। খেজুর রস প্রকৃতপক্ষে এই শর্করা মেশানো জল। জলের স্বাদের এই তারতম্যের জন্য অলৌকিকত্বের ধারণা গড়ে ওঠে। এই কথাটা স্পষ্টভাবে বলতে চাই গাছের ক্ষতস্থান বা কাটা অংশ দিয়ে জল বেরিয়ে আসার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই।

— জয়দেব দে।

পরিবেশ বিপন্ন

৫ পাতার পর

সময়ে শুভ বুদ্ধির উদয় এধরনের বিপর্যয় থেকে বিরতি দেয়। সুতরাং দক্ষিণ মেরুতে বর্জ্য লোহা কিছুটা হলেও তাপমাত্রা বাড়াবে। ফলে একদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-উভয়ের চাপে যে কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। লাভের থেকে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেরু অঞ্চলে বহু অভিযান হয়েছে। আশা করা যায়, লোহা কিছু হলে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেখানে গুল্ম বা ফাইটোপ্ল্যাংটন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আসলে এখানে আমেরিকার একটি পলিসি কাজ করেছে। তা হল, দূষণ থেকে মানুষের দৃষ্টিটা সরিয়ে দেওয়া। ক্যালিফোর্নিয়ায় দূষণ যে কি মারাত্মক আকার নিয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। 'এল নিনো' এর ফলে ইন্দোনেশিয়ায় আগুন লাগে বনাঞ্চলে। এই ঘটনার জন্যও সম্পূর্ণরূপে দায়ী ইউ এস এ। কারণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পলিউশন এতো হাই হয়, যার ফলে সৃষ্টি হয় ভ্যাকিউমের। ফলশ্রুতি 'এল নিনো'। আর ফেলে দেওয়া লোহা বিক্রির বাজার সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টাও বটে। যা এখনই বোঝা যাবে না। ৫ থেকে ১০ বছর বাদে বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে বড় বড় বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে বিজ্ঞান পত্রিকায় আলোচনার ভেতরে নিহিত থাকবে মূল উদ্দেশ্য— বাজার-বিক্রি-বি ইউ ওয়াই ই আর। কিউটো প্রোটোকল আমেরিকা মানতে চাইনি। মূল পলিউশন কমানোর প্রচেষ্টা তথা পৃথিবীকে বাঁচানোর থেকে এরা বেশি দেখে ওদের বাণিজ্য। পলিউশনের হিরো হল মার্কিন দেশ। অথচ এরা কোনওভাবেই মানবে না দূষণ বিরোধী তত্ত্বকে। সুতরাং এই বাণিজ্যনীতি তথা পরত পরানোর পলিসি চলতেই থাকবে।

— বৈদ্যনাথ নন্দী, হাওড়া।

লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী বনবিড়াল

বনদপ্তরের এক সমীক্ষায় জানা যায় নদীয়া জেলার বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী (যেগুলি বন-বাদারে আছে) গুলির অস্তিত্ব খুবই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বনবিড়ালগুলো বনাঞ্চলে খাদ্য যোগাড় করতে না পেরে গ্রামের বিভিন্ন লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। গ্রামের শিকারীদের নজরে পড়ছে। বিরল প্রজাতির বনবিড়ালগুলিকে ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বনবিড়ালগুলিকে গ্রামবাসীরা ধাওয়া করে নির্মমভাবে মারে। সম্প্রতি নদীয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের বেটনায় একটি স্ত্রী প্রজাতির বনবিড়ালকে ধানের ক্ষেতে দেখা যায় গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে একটি লোহায় খাঁচায় এই বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বনবিড়ালটিকে খাঁচায় ধরে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এবং কিছুদিন পরে ৭টি বাচ্চা প্রসব করে। এরপর বনদপ্তরের কাছে (বেথুয়াডহরী অভয়ারণ্যে) পাঠিয়ে দেন। ফলে বনবিড়াল প্রজাতিটি রক্ষা পায়।

বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার নক্সালবাড়ী বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা ৪৪টি বিরল প্রজাতির পাখি চোরা শিকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। এদের মধ্যে ১৬টি Large Indian Parakeets (ভারতীয় টিয়াপাখি: ল্যাজঝোলা) ২২টি Rose Ringed Parakets (গোলাপী টিয়া পাখি: লেজের পেছনে গোলাকৃতি) ৬টি Hill Mynahs. (পাহাড়ী ময়না) সবগুলি পাখিকেই বনদপ্তরের টুকরিঝড় রেঞ্জ অফিসে রাখা হয়। পরে পাখিগুলিকে 'সুকনা' জঙ্গলে বন্যপ্রাণী বিভাগকে দেওয়া হয়। এধরনের পাখিগুলি স্থানীয় অঞ্চল থেকে চোরা শিকারীরা মাত্র ৫০-৬০ টাকায় কিনে নেয়। অথচ এই বিরল পাখিগুলি ৬০০-১০০০ টাকায় তারা বিক্রি করে।

পাখিগুলি ডিমের খাঁচায় করে নিয়ে বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিজ্ঞানকর্মীরা জানান, মাঝে মাঝেই চোরাশিকারীরা এইভাবে বিরলপ্রজাতির পাখি বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে পাচার করে। অবিলম্বে বনদপ্তরের এই ধরনের বিরলপ্রজাতির পাখিগুলি যাতে চোরা শিকারীদের কবলে পরে বিলুপ্ত না হয় সেদিকে কড়া নজরদারি রাখা উচিত। *সূত্র : The Telegraph (NE), 11-05-06*

আপনি কি চান? — নিউক্লিয় চুল্লি না অপ্রচলিত শক্তি

এককভাবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের শক্তির উৎপাদনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তা বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে প্রশ্ন চিহ্ন রেখে থাকে! এখন দেখা যাক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কত পরিমাণ শক্তি কিভাবে পেয়ে থাকি —

যেসকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে শক্তি পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে প্রধান হল ইউরেনিয়াম $_{92}U^{235}$।

এই ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়ার চুল্লিতে প্রধান জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ইউরেনিয়ামকে নিউক্লিয়ার ফিসান পদ্ধতিতে একটি নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয় ফলে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস প্রায় সমান দুটি নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে যায় এবং নিউট্রন বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত করে। এই পদ্ধতিটি খুব সম্পন্ন হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় কম সময়ে। ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে নিম্নলিখিতভাবে ভাঙ্গে

$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{37}Rb^{90} + {}_{55}Cs^{144} + 2\,{}_{0}n^{1} +$ শক্তি

$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{35}Br^{87} + {}_{57}La^{146} + 3\,{}_{0}N^{1} +$ শক্তি

$_{92}U^{235} + {}_{0}n^{1} \rightarrow {}_{36}Kr^{96} + {}_{56}Ba^{137} + 3\,{}_{0}N^{1} +$ শক্তি

এই বিভাজন নির্ভর করে ফিসান পদ্ধতির উপর দেখা গেছে প্রতি নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে গড়ে 200 Mev. শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ২০০ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট(Mev) শক্তি 2×10^{7} k cal শক্তির সমান। এই বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসের ভর হ্রাসের ফলে। এই পদ্ধতিতে অতি কম সময়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি খুব দ্রুত পাওয়া যায়। কারণ নিউক্লিয়ার রিয়েকটরে প্রচুর সংখ্যক ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস থাকে এবং প্রতিটি বিভাজনে আবার ৩টি করে নিউট্রন নির্গত হয় যাহার সংখ্যা পরবর্তীকালে আরো বাড়ে।

এখানে একটি নিউক্লিয় রিয়্যাক্টর এর নকসাচিত্র দেওয়া হল এবং কিভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় বর্ণনা করা হল।

এ পর্যন্ত পড়ে এখন মনে হতে পারে অতি সহজে যখন শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তা হলে শক্তি উৎপন্নে পারমানবিক শক্তির সাহায্য নেব না কেন? এই ইউরেনিয়াম রিয়াকটরের কিছু অসুবিধা আছে।

অসুবিধা : রিয়াকটরে যে ইউরেনিয়াম $_{92}U^{235}$ ব্যবহার করা হয় তাহা আসলে অ্যাকটিনিয়াম $(4n + 3)$ শ্রেণীর মৌল এবং ইহার অর্ধজীবন 7.1×10^{8} বছর। সুতরাং উপরের তথ্য থেকে ধারণা করা যায় 1g $_{92}U^{235}$ থেকে 1/2g $_{92}U^{235}$ হতে 7.1×10^{8} বছর সময় লাগে। এই তেজস্ক্রিয় ধর্ম কোন কিছু দ্বারা আটকানো সম্ভব নয়। কারণ $_{92}U^{235}$ যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয় তা জীবকুলের ক্ষতিসাধন করে থাকে। এর থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। আবার তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বিকিরণ হয় তা ইক্সপোনোসিয়ালী ডিকে হয় (Exponantial Decay) সুতরাং এই বিকিরণ দীর্ঘস্থায়ী, প্রতিনিয়ত ইউরেনিয়াম সর্বদা বিভাজিত হয়ে চলেছে উহা নিম্নলিখিতভাবে বিভাজিত হয়—

$$_{92}U^{235} \xrightarrow{\alpha} {}_{90}Th^{231} \xrightarrow{\beta} {}_{91}Pa^{231} \xrightarrow{\alpha} {}_{89}Ac^{227} \xrightarrow{\beta} {}_{90}Th^{227} \xrightarrow{\alpha} {}_{88}Ra^{223}$$

$$\xrightarrow{\alpha} {}_{86}Rn^{219} \xrightarrow{\alpha} {}_{84}Po^{215} \xrightarrow{\alpha} {}_{82}Pb^{211} \xrightarrow{\beta} {}_{83}Bi^{211} \xrightarrow{\alpha} {}_{81}Tl^{207}$$

$$\xrightarrow{\beta} {}_{82}Pb^{207}$$

বিভাজনের ফলে যে নতুন মৌল উৎপন্ন হয় সেগুলিও তেজস্ক্রিয় মৌল হয়। এই তেজস্ক্রিয় বিভাজন শেষ হয় লেড মৌলে $_{82}Pb^{207}$। এই সকল মৌলগুলির কম-বেশি অর্ধায়ু আছে। নিউক্লিয় রিয়াক্টর থেকে যে ছাই বা জ্বালানি ভগ্নাংশ পড়ে থাকে তাকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব নয় এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এই জ্বালানি অবশেষের জীবকুলের উপর যে প্রকট প্রভাব তা বলে বুঝান দায়। ইহার প্রভাব এতই ভয়াবহ যে এর প্রভাব প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

আমরা এখানে স্থূল বুদ্ধি থেকে এক ধাপ উপরে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা জীবকুলের উপর তেজস্ক্রিয়তার কুফল আলোকপাত করব। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে α, β, ও γ রশ্মির বিকিরণ হয় তা বায়ু, জল, মাটির দূষণ ঘটিয়ে থাকে। এই দূষণকে বন্ধ করা সম্ভব হয় না এর কোনও পথ থাকে না। এই বিকিরণ মানুষের ক্যানসার সৃষ্টি করে থাকে। উদ্ভিদ জগৎ ও এর থেকে রক্ষা পায় না, তেজস্ক্রিয়তার বাস্তব প্রভাব মানুষকে বুঝিয়ে উঠতে পারব কিনা জানি না! উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি জাপানে যে অ্যাটাম বোমা ফেলা হয়েছিল সেই বোমা এর সরলিকৃত রূপ এই নিউক্লিয় চুল্লি। এই অ্যাটাম বোমার যে পরিমাণ ধ্বংস করার ক্ষমতা ও শক্তি উৎপন্নের ক্ষমতা এই রিয়েক্টরের ক্ষমতাও প্রায় সমান। এই সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি লিখিতভাবে যত সহজ বাস্তবে ইহা এত সহজ নয়।

এই নিউক্লিয় চুল্লি থেকে শক্তি উৎপন্নের আরও একটি দিক হল এই অর্থনৈতিক যুগে এই সকল চুল্লি চালাতে খরচ খুব বেশি যা ভারতের মত দেশের পক্ষে সহনশীল নয়। আরও দেখা যাচ্ছে যে জ্বালানি অবশেষে নিষ্ক্রিয় করতে যে খরচ হচ্ছে সেই খরচের পরিমাণ অনেক বেশি। এই নিউক্লিয় চুল্লির পিছনে না ধেয়ে অপ্রচলিত শক্তি উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বরঞ্চ শক্তির যোগান আরও সুলভ হবে।

অপ্রচলিত শক্তি উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ শক্তি সমুদ্রশক্তি ও জীবভর শক্তি।

সৌরশক্তি : ভূপৃষ্ঠের প্রতিবর্গ মিটারে যে সৌরশক্তি এসে পড়ে তার পরমাণ ১.৩৬ কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমান। এই পরিমাণ শক্তিকে সৌরকোষ দ্বারা আবদ্ধ করা যেতে পারে। সোলার পন্ড এবং ব্রাঙ্কন চক্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। আবার সৌরকোষের প্রতিটি মডিউল থেকে ৩৫ ওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভব।

হাওয়া থেকে শক্তি : বায়ুকে ব্যবহার করে প্রায় ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার হাওয়া কল চালিত জেনারেটর স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে এই ভারতে।

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

New Dynamic Engineer's Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
354, Siraj Mondal Rd.
Kanchrapara. Ph: 2585-9243

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

প্রশ্নোত্তর

১৬.০২.২০০৬ কাঁচরাপাড়া হাইডমার্শ ইন্‌স্টিটিউটে সারাদিন ব্যাপী এক বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৩৫টি স্কুলের যষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই সংখ্যায় যষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে ৭ টি প্রশ্নের সেরা উত্তর ছাপান হল (সামান্য সংশোধন সহ) — *সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক।*

১। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গ্রহ কয়টি ও কি কি?

উ : জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গ্রহ নয়টি। গ্রহগুলি হল— রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু।

— *রনজিৎ ঘোষ, মিষ্টু চক্রবর্তী, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল।*

২। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে গ্রহ কয়টি ও কি কি?

উ : জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে গ্রহ নয়টি। গ্রহগুলি হল— বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো।

— *রনজিৎ ঘোষ, মিষ্টু চক্রবর্তী, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল।*

৩। রাহু ও কেতু প্রকৃতপক্ষে কি?

উ : পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষপথ দুটো বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে। তাদেরই একটি রাহু ও অন্যটি কেতু।

— *রনজিৎ ঘোষ, মিষ্টু চক্রবর্তী, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল।*

৪। জাতকের রাশি ও লগ্ন কিভাবে নির্ধারিত হয়?

উ : জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশি ও লগ্ন নিয়ে জাতকের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। ১২টি নির্দিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডল সৌরজগতকে চক্রাকারে ঘিরে রয়েছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলগুলিকে বলে রাশি। সেকারণেই রাশির সংখ্যা ১২টি। আর জন্মের সময় চাঁদ যে নক্ষত্রমণ্ডলে থাকে সেই নক্ষত্রমণ্ডলটিই নবজাতকের রাশি। রাশিগুলি হল— সিংহ, মেষ, বৃষ, তুলা, ধনু, মকর, কর্কট, বৃশ্চিক, কন্যা, কুম্ভ, মীন ও মিথুন।

আর জন্মের সময় পূর্ব আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায় সেটাই নবজাতকের লগ্ন।

—*সুপর্ণা সরকার, সুস্মিতা ঘোষ, এ ডি পি গার্লস হাইস্কুল।*

৫। হাতের রেখা সৃষ্টি হয় কিভাবে?

উ : ভ্রুণ অবস্থা থেকে পরিণত শিশু, মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিশেষ অবস্থার ফলে ভাঁজ অনুযায়ী শিশুদের অর্থাৎ মানুষের হাতে রেখার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ হাতের রেখার সাথে গ্রহ-নক্ষত্রের বা মানুষের ভাগ্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

— *শ্রেয়া সরকার, রাজশ্রী পাল, কাঁটাগঞ্জ গোকুলপুর আদশ শিক্ষায়তন।*

৬। জ্যোতিষীদের কাছে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য যাওয়া উচিত কিনা ব্যাখ্যা কর।

উ : মানুষ যখন তাঁর জীবনে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তারা চিন্তা করে, কিভাবে তাঁর জীবনে সুখ আসবে? এই কথা ভেবে সাধারণ মানুষ জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হয়, ভবিষ্যৎ জানা এবং সমূহ বিপদ কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। জ্যোতিষীরা সেই সুযোগ নিয়ে ভবিষ্যৎবাণীতে এমন শব্দ ব্যবহার করে যা থেকে মানুষের মন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্যোতিষীরা এমন বিষয়গুলি বেছে নেয় যা সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়। ফলে আরও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি আমরা। এই কারণে জ্যোতিষীদের কাছে যেতে নেই।

— *রনজিৎ ঘোষ, মিষ্টু চক্রবর্তী, যষ্ঠ শ্রেণি, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল।*

৭। জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা এদের মধ্যে কোনটি বিজ্ঞানসম্মত ও কেন? ব্যাখ্যা কর।

উ : জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা এদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক একটি শাস্ত্র।

কারণ, জ্যোতির্বিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যার দ্বারা আমরা মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কদের স্বরূপ বুঝতে পারে। এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর।

কিন্তু জ্যোতিযশাস্ত্র একটি অবৈজ্ঞানিক কল্পিত শাস্ত্রমাত্র। অতীতে মানুষ মনে করত মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী। অর্থাৎ ভূকেন্দ্রীক তত্ত্বে জ্যোতিষশাস্ত্র গঠিত। ১৫৪৩ সালে কোপারনিকাস এই বিশ্বাসে আঘাত হেনে জানালেন যে, সূর্য এই সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত। অর্থাৎ গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এবং বাস্তবে সৌরজগতে সত্যিই সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি এবং গ্রহগুলিকে কেন্দ্র করে উপগ্রহগুলি ঘুরছে। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের এমনকি চাঁদেরও ঘূর্ণনের কথা বলা হয়। এছাড়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে উপগ্রহের কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় না। ফলে জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত।

— *শ্রেয়া সরকার, রাজশ্রী পাল, কাঁটাগঞ্জ গোকুলপুর আদশ শিক্ষায়তন।*

নিউক্লিয় চুল্লি না অপ্রচলিত শক্তি

৭ পাতার পর

বায়ু থেকে শক্তি অতি সহজেই উৎপন্ন হয়।

জীবভর শক্তি : প্রাণীর বর্জ্য— গোবর, অন্যান্য জীবজন্তুর বর্জ্য পচনের ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। ভারতে এক বছরে গবাদি পশুর যত মল পাওয়া যায় তার ৭৫ শতাংশ থেকে মোট ২,২৫,০০০ লক্ষ ঘনমিটার বায়োগ্যাস উৎপন্ন হতে পারে। ফলে এক বছরে ১২,০০০০০ টন জ্বালানি কাঠের সাশ্রয় হবে।

পরিশেষে একটা ছোট্ট তথ্য উল্লেখ করছি — যষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে পরিবেশ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পরমাণু চুল্লি সম্পর্কে এবং পারমাণবিক বর্জ্য সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেখানে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই ক্ষতিকারক বর্জ্য নিয়ে আমরা কি করব? আসুন না আমরা সবাই মিলে এই একই প্রশ্ন তুলি এই ক্ষতিকারক বর্জ্য নিয়ে আমরা কি করব?

— *সুজয় বর্মন।*

পড়ুন ও পড়ান

গণবিজ্ঞানবার্তা
উৎস মানুষ
জ্ঞান ও বিজ্ঞান
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
টপকোয়ার্ক
মাসিক গণস্বাস্থ্য
প্রগতিবার্তা

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মণ্ডলী— পান্নালাল মানি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* *E.mail-* **ganabijnan@yahoo.co.in.**